সংবাদ

তারিখ '18 SEP ... ... ৭ ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বইয়ের ভার কমানো হোক

সামসুল ইসলাম টুকু

১

বইয়ের ভার দু'রকম। একটি বইয়ের ওজনের ভার এবং অন্যটি বই পড়ার ভার। সেই ভার যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ও বহনযোগ্য না হয়, সেটা শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারো জন্য ভালো নয়। এমনকি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যও ভালো নয়। শিক্ষা বিভাগের অতি উৎসাহী কর্মকর্তাদের কল্যাণে এমনটাই হয়েছে।

কিছুদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষার বইয়ের ভার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এবং পরামর্শ এসেছিল, একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর দেহের ওজনের এক-দশমাংশ হতে হবে তার বই খাতা ও ব্যাগের ওজন। যেন শিক্ষার্থীরা বইয়ের ভার বহনে কষ্ট না পায়। এ সমস্যার সমাধান হয়নি অদ্যাবধি। এখন একই ধরনের প্রশ্ন উঠেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। তবে এবার বইয়ের ওজনের ভার বহন নয়, বই পড়ার ভার বহন করার প্রশ্ন। প্রশ্ন তুলেছেন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। এই শ্রেণীর বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে দুই পেপারের জন্য দু'টি করে চারটি বই শিক্ষা বোর্ড তথা এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত। কিন্তু ঐ তিন বিভাগের আরও প্রায় ২০টি বিষয়ের ৪০টি পেপারের প্রতিটি পেপারের জন্য ১০/১৫ জন লেখকের ১০/১৫টি করে বইয়ের অনুমোদন দিয়েছে এনসিটিবি। প্রশ্নটা এখানেই। শিক্ষকরা কি ১৫জন লেখকের ১৫টি বই পড়াবেন? অভিভাবকরা কি প্রতিটি পেপারের ১৫টি করে বই কিনবেন? এবং শিক্ষার্থীরা কি ১৫টি করে বই পড়বে?, যা শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব কি না? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর কারো কাছে নেই। অন্যদিকে বই অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, লেখক ও পাবলিশার্সদের একান্ত যোগাযোগের মাধ্যমে এই বিপুলসংখ্যক বইয়ের বোঝা চাপিয়ে মুক্ত হয়ে গেছে।

অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বলেছেন, অনুমোদনকৃত ১৫ জন লেখকের লেখা বইগুলো কোনটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। কোথাও না কোথাও কোন না কোন তথ্যের ঘাটতি আছে, নতুন নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের সংযোজনের ঘাটতি আছে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তফাৎ আছে, কোনটিতে সিলেবাস বহির্ভূত বিষয় আছে, কোনটিতে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় অনুপস্থিত রয়েছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের একটি বই যা প্রফেসর ড. জয়নাল আবেদীন, প্রফেসর এস.এম ওয়াহিদুজ্জামান, প্রফেসর সায়েন উদ্দিন ও প্রফেসর আব্দুল মান্নানের লেখা বইটিতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা সম্পর্কে নতুনভাবে আবিষ্কৃত পি.এম ১০ বা পার্টিকুলেট ম্যাটার ১০ তথ্যটি সংযোজিত হয়েছে। অথচ একই সময়ে ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী ও অধ্যাপক হারাধন নাগের লেখা রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের বইটিতে উল্লিখিত তথ্যটি অনুপস্থিত। কোন কলেজে ওই চার লেখকের বইটি গৃহীত হয়েছে আবার কোন কলেজে দু'জন লেখকের লেখা বইটি পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই দুই লেখকের বইটি যারা পড়বে

তারা উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষায় অথবা উচ্চতর শিক্ষার অ্যাডমিশন টেস্টে পি.এম ১০ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা ঝরে পড়বে। এই ব্যর্থতার দায় কার সে বিচারের সময় এখনই।

সত্তরের দশক পর্যন্ত আমরা দেখেছি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বাংলা ইংরেজির মতো অন্যান্য বিষয়গুলো একটি পেপারের জন্য একটি বা দুইটি বই অনুমোদিত ছিল। তখন কি মেধার বিকাশ হয়নি? আর এখন ১৫ জন লেখকের ১৫টি বই পড়ে কি মেধা ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে? এ প্রশ্ন রইলো বই অনুমোদনকারী সংস্থা এনসিটিবির কাছে। আরও একটা প্রশ্ন হচ্ছে, সৃজনশীল পরীক্ষা দিয়ে যারা উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন তারা কি রচনামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের চেয়ে বেশি মেধাসম্পন্ন? যদি হয়, তবে এ সংক্রান্ত কোন জরিপ কি এনসিটিবি'র কাছে আছে? ১০/১৫ কেন, তার চেয়ে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ লেখকদের তালিকাভুক্ত করতে পারে এনসিটিবি। তাদের নিয়ে বোর্ড অব রাইটার্স, বোর্ড অব এডিটর্স গঠন করতে পারে কিন্তু তাদের লেখায় ও সম্পাদনায় একটি পেপারের জন্য একটি বই হতে হবে। থাকবে একটি সিলেবাস সকল শিক্ষা বোর্ডের জন্য। সে বই পড়েই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে শিক্ষার্থীরা এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে। তা হলেই সত্যিকারের মেধা যাচাই সম্ভব হবে। প্রতিটি পত্রের জন্য ১৫টি করে কয়েক ডজন বই পড়ার ও কেনার অকারণ ভারমুক্ত হবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বড় ধরনের বিপর্যয় আসবে। যেমনটা ৯৮% পাশের হার দিয়ে লাখ লাখ বেকার সৃষ্টি হয়েছে, হাজার হাজার গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে উচ্চতর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না, মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা হচ্ছে কম।

২

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি বিষয়ে অনির্ধারিত এক আলাপচারিতার অংশ তুলে ধরে এ লেখার সমাপ্তি টানবো। একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে আলাপ চলছে চার শিক্ষকের। একজন ওই কলেজের অধ্যক্ষ, একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং দু'জন অন্য একটি সরকারি কলেজের অল্প বয়সী শিক্ষক। কথায় কথায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বললেন, আজকাল শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নেয় না। কলেজের বাইরে সময় কাটায়। উত্তরে অল্প বয়সী দু'জন শিক্ষক বললেন, কলেজের ২/৩টি ক্লাস নিতে হিমশিম খান ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাই স্বস্তি নেয়ার জন্য কলেজের বাইরে সময় কাটান। তাছাড়া সারাদিন কলেজে থাকলে রাতে বাড়িতে গিয়ে আগামীকালের পাঠক্রমের লেখাপড়া করার ধৈর্য থাকে না। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বললেন, কলেজের বাইরে যাবেন কেন, অবসর পিরিয়ডে কলেজের লাইব্রেরিতে আগামী কালের পাঠক্রম পড়ে নিবেন, দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের যত্ন নিবেন, আর রাতে বাড়িতে গিয়ে ঘুমাবেন। উত্তরে ওই দু'জন শিক্ষক বললেন, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কলেজে সময় দেয় আদৌ সম্ভব নয়, তাছাড়া ক্লাসের অবসরে কলেজের বাইরে যেতে বাধা কোথায়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বললেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যখন আপনাদের নিয়োগ দেন তখন ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কলেজে অবস্থান করার জন্যই দিয়েছেন। বিভিন্ন স্কুল, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অফিস করেন। সুতরাং আপনারা পারবেন না কেন। এবার ঐ শিক্ষক দু'জন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বললেন, আপনি যখন শিক্ষক ছিলেন তখন ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কলেজে অবস্থান করেছেন। এখন অবসরে গিয়ে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তাছাড়া চাকরি বিধির কোথায় লেখা আছে যে, ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কলেজে থাকতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দাবি করে বললেন, আমাদের সময় আমরা ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কলেজে থেকেছি কোন ব্যতিক্রম ছাড়া। অবসর পিরিয়ডে লাইব্রেরিতে পড়েছি। ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে মান উন্নয়নের পরামর্শ দিয়েছি। এবার ওই শিক্ষক দু'জন কিছুটা সংকুচিত হয়ে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকগণ ১টির বেশি ক্লাস নেন না। প্রচুর বেতন পান, পিএইচডি করার জন্য বিদেশ যেতে পারেন তাদের কোন সমালোচনা হয় না। অথচ আমরা ২/৩টি ক্লাস নেয়ার পরও সমালোচনা হয়। এবার অধ্যক্ষ মহাশয় মুখ খুললেন। বললেন পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিটি শিক্ষকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাজিরা খাতা রয়েছে। সেখানে শিক্ষক কখন কলেজে এলেন, কয়টি ক্লাস নিলেন, অবসর পিরিয়ডে তার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মান উন্নয়নে কি করলেন, কখন কলেজ ত্যাগ করলেন, তা লিপিবদ্ধ করতে হয় শিক্ষককে। অর্থাৎ তারা নিজেদের জবাবদিহি নিজেরাই করেন। যে নিয়ম বাংলাদেশে অনুপস্থিত। তাই অবিলম্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ধারা শুরু করা আবশ্যক। কারণ, সারা দেশেই শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধ বর্ণিত আলাপচারিতার মতই। এর পরিবর্তন জরুরি।

[লেখক : সাংবাদিক]

পরিচালক
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর